নগর সরকারই সমাধান

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর- সদস্য, জাতীয় কমিটি, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৩ এপ্রিল ২০১৫)

ঢাকা মহানগরীতে সুশাসন ও সেবা নিশ্চিত করতে হলে বর্তমান 'সিটি করপোরেশন' কাঠামোতে আর তা পুরাপুরি সম্ভব নয়। প্রতিবছরই ঢাকায় জনসংখ্যা বাড়ছে। অথচ ঢাকার নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সেই তুলনায় বাড়ছে না। সাম্প্রতিককালে ঢাকা সিটি করপোরেশনকে সরকার দুই ভাগ করেছে সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে। কিন্তু দুই ভাগ নয়, দশ ভাগ করলেও বিদ্যমান কাঠামোতে সেবার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ ঢাকা মহানগরী শাসনের প্রধান সমস্যা হলো একক কর্তৃপক্ষের অভাব। সিটি করপোরেশন বা মেয়রের কোনো একক কর্তৃত্ব নেই। যদিও সিটি করপোরেশন ও মেয়র জনগণের ভোটে নির্বাচিত।

ঢাকায় ৫৬টি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা রয়েছে। এগুলো আটটি মন্ত্রণালয়ের অধীন। প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় তাদের নীতি অনুযায়ী তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করে। সিটি করপোরেশন ও মেয়র স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কোনো প্রতিষ্ঠানের উপরেই তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। ফলে মেয়রের পক্ষে ৫৬টি প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে ঢাকা মহানগরীতে যে যার মতো করে কাজ করে। নির্দেশনা দেয়া তো দূরের কথা, মেয়র কোনো সভা ডাকলেও প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা সেখানে যোগ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। এভাবে একটি বড় শহরের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।

বর্তমানে ঢাকার জনসংখ্যা এক কোটি ২৫ লাখের মতো। আমরা মনে করি, সোয়া কোটি জনসংখ্যার জন্যেও বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থা অকেজো। বিশ্বে বহু দেশ রয়েছে যাদের জনসংখ্যা এক কোটিরও কম। ভারতসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বড় শহরকে আলাদা প্রশাসনিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এগুলো কোনো নতুন ধারণা নয়।

ঢাকা মহানগরে যদি আমরা সুশাসন নিশ্চিত করতে চাই তাহলে অবিলম্বে 'নগর সরকারব্যবস্থা'র দিকে আমাদের যেতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার শুধু ঢাকার জন্য নগর সরকারের আইন প্রণয়ন না করে দেশের ক্রমবর্ধমান নগরগুলোর জন্যে একই আইন করতে পারে। যেমন, যে নগরে জনসংখ্যা পঞ্চাশ লাখ অতিক্রম করবে সেই নগরে নগর সরকার গঠন করা হবে।

নগর সরকার হবে একটি পৃথক প্রশাসনিক কাঠামো। নগর সংসদ, নগর প্রশাসন ও নগর আদালত মিলে নগর সরকার গঠিত হবে। মেয়র নগর সরকারের প্রধান হবেন। কাউন্সিলররা নগর সংসদের সদস্য হবেন। এই সংসদ শুধু নগরের জন্যে নীতি প্রণয়ন করবে। নগর সংসদে নগরের সমস্যা আলোচিত হবে। নগরীর সব সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান নগর সরকারের অধীন হবে। মেয়র নগরীর মাস্টার প-্যান অনুযায়ী নগরীর উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করবেন বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে। নগর পুলিশের মাধ্যমে নগরীর শান্ড়ি-শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন।

এভাবে ঢাকা-সহ সকল মহানগরীর সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে একক কর্তৃপক্ষ ও কর্তৃত্বের অধীনে আনতে পারলেই নগরীর সেবা কর্মসূচিগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হবে। এটা সম্ভব হলে সরকারের অর্থ অপচয় রোধ ও জনগণের দুর্ভোগ কমানো সম্ভব হবে। নগর সরকার হলেই যে সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে বড় ধরনের ওলটপালট হবে তা নয়। সরকারি সেবা সংস্থা যেমন, ওয়াসা, নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, অগ্নিনির্বাপন কর্তৃপক্ষ, সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারের নানা সংস্থা, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির স্থানীয় পরিচালকবৃন্দ সবাই তাদের বাজেট ও দায়িত্ব-সহ নগর সরকারের অধীনে চলে যাবেন। নগর সরকারের নির্দেশনায় তাঁরা পরিচালিত হবেন। কেন্দ্রীয় সরকার একটি পৃথক পুলিশ বিভাগ রাখতে পারে। বিচার বিভাগও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকবে। তবে নগরীর ছোটখাট অপরাধ নিস্পত্তির জন্যে একটি 'নগর আদালত' রাখা যেতে পারে।

নগর সরকার প্রধান নির্বাচিত কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব দেবেন। যাতে নগরীর সব সমস্যা নিয়ে মেয়রকে একা মাথা ঘামাতে না হয়। এই 'সমন্বয়কারীরা' কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীর মতো স্থানীয়ভাবে মন্ত্রীর ভূমিকা পালন করবেন। মেয়রের কাছে তাঁদের জবাবদিহিতা থাকবে। সাধারণ নাগরিকরাও এই সমন্বয়কারীদের কাছেই তাঁদের অভিযোগ জানাবেন। প্রতিটি সেবাদানকারী সংস্থার কাজ সমন্বয়ের জন্যে মেয়রের কার্যালয়ে কাউন্সিলরদের জন্য পৃথক কার্যালয় (মন্ত্রণালয়) থাকবে। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা যেমনিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তেমনি মেয়রের নেতৃত্বে একটি 'নগর নির্বাহ পরিষদ' নগরের শাসন পরিচালনা করবে। নগর কাউন্সিলের সদস্যগণ নগরের পার্লামেন্ট হিসেবে নিয়ম নীতি প্রণয়ন এবং 'নগর নির্বাহ পরিষদ'কে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখবেন।

বর্তমানে সিটি করপোরেশনগুলোতে যে পদ্ধতিতে নির্বাচন হয় তাও ত্র"টিপূর্ণ। এখন মেয়র নির্বাচিত হন ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে। বৃহত্তর ঢাকা শহরেই আটজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। আর দুজন মেয়রকে নির্বাচিত হতে হয় আটজন সংসদ সদস্যের নির্বাচনী এলাকায়। মেয়র প্রার্থীর পক্ষে এটা খুবই ব্যয়বহুল, পরিশ্রমসাপেক্ষ, শ্রমসাপেক্ষ কাজ। মেয়র তাঁর কাজে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে না পারলে বা ব্যাপকভাবে দুর্নীতি করলেও তাঁকে পদ থেকে সরানোর কোনো সুযোগ নেই। কারণ তিনি

পাঁচ বছরের জন্যে নির্বাচিত। অন্য কোনো আইনেও অযোগ্য মেয়রকে সরানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নির্বাচিত মেয়রের কাছে জনগণ পাঁচ বছর জিম্মি হয়ে যায়। কারণ মেয়র সিটি করপোরেশনের প্রধান। তিনি নগরীর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।

এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্যে আমরা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্যে প্রস্ড়াব করছি। এটা পরিবর্তন নয়, কেন্দ্রীয় সরকার গঠন পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রস্ড়াব করছি মাত্র। কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচিত হচ্ছে সংসদীয় পদ্ধতিতে, কিন্তু একই দেশের সিটি করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হচ্ছে 'রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে'। এটা ঠিক নয়। এক দেশে দুই রকম নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আমাদের প্রস্ড়াব: সিটি করপোরেশনে শুধু কাউন্সিলর (এমপি) নির্বাচিত হবে। দলীয় ভিত্তিতেই এই নির্বাচন হতে পারে। বাংলাদেশে দলের বাইরে কোনো বড় নির্বাচন হয় না। যেসব নির্বাচনে দলের কথা বলা হয় না সেসব নির্বাচনেও পরোক্ষভাবে দল ভূমিকা পালন করে। কাজেই আমরা মনে করি, সিটি করপোরেশনের নির্বাচনও দলীয় ব্যানারে হতে পারে, তবে নির্দলীয় প্রার্থিতার সুযোগও পরিপূর্ণভাবে বহাল রাখতে হবে।

নির্বাচিত কাউন্সিলররা তাঁদের নেতা নির্বাচন করবেন। নির্বাচনী প্রচারণার সময়ই নেতা ও তাঁর পরিষদের নাম ঘোষণা করা যায়। ভোটাররা তখন একটি প্যানেলকে নির্বাচিত করবেন। সংসদীয় পদ্ধতিতে সিটি করপোরেশনের নির্বাচন হলে মেয়র একনায়ক হতে পারবেন না। কাউন্সিলরদের ভোটেই তাঁকে মেয়র হতে হবে। কাউন্সিলররা চাইলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে মেয়র পরিবর্তন করতে পারে। যেমন পরিবর্তন করতে পারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। কাজেই এই পদ্ধতি নতুন কিছু নয়।

আমাদের নিকট প্রতিবেশী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় সরকার এবং কলকাতা ও দিলি- র নগর শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করেও নির্বাচন ও শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে আরও বাস্ড়ব ধারণা লাভ করা যায়। ঢাকা মহানগরীতে জনসংখ্যা যেভাবে বেড়েছে এখানে সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে নগর সরকারের মত একটি নতুন কাঠামোতে যেতে হবে। ঢাকা মহানগরের দুই সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের পরপরই এর কাঠামো পুনর্গঠনের চিন্ড়াকেও সমতালে অগ্রসর করা উচিত।

এবার ঢাকায় নির্বাচনী প্রচারণায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত একজন মেয়র প্রার্থী বলেছেন: 'কাজ করার ইচ্ছা থাকলে আইন খুব একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না। আমি নির্বাচিত হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একজন মেয়র যেভাবে কাজ করতে পারে, সেভাবেই সহযোগিতা চাইব।' (*কালের কণ্ঠ*, ১৬ এপ্রিল ২০১৫)

এই বক্তব্যের একটা অংশের সঙ্গে আমি আংশিক সহমত পোষণ করি। যে কোনো কাজে নেতার ইচ্ছাশক্তি খুব গুর"ত্বপূর্ণ। ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অনেক কিছু অর্জন করা যায়। তবে বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, দুর্নীতি ও কলুষিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণে এদেশে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের ইচ্ছা থাকলেই ইতিবাচক সবকিছু করতে পারেন না। তাঁকে আমলাতন্ত্র ও আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

একথা সত্য যে, একজন নির্বাচিত মেয়র সরকার প্রধানের আস্থাভাজন থাকলে তাঁর পক্ষে অনেক কাজ করা সম্ভব। এটাই বাস্ড়বতা। কিন্তু এরকম মেকী বাস্ড়বতা আমাদের কাম্য নয়। আমরা চাই, নির্বাচিত মেয়র সিটি করপোরেশনের আইনের জোরে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। নির্বাচিত মেয়র সরকারি দলের নাও হতে পারেন। তাহলে কি তিনি কোনো কাজ করতে পারবেন না?

এবারের সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অনেক মেয়র প্রার্থী সুন্দর সুন্দর প্রতিশ্র"তি দিচ্ছে। এগুলো শুনতে খুব ভালো শোনায়। কিন্তু বাস্ড়ব সত্য হলো মেয়রের পক্ষে অনেক প্রতিশ্র"তি বাস্ড়বায়ন করা সম্ভব নয়। কারণ সেবাদানকারী সব প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁর কর্তৃত্ব নেই। হাতেগোনা কয়েকটি কাজ ছাড়া তিনি স্বাধীনভাবে আর কিছু করতে পারেন না।

তাই আমরা প্রস্ড়াব করছি: সরকার নতুন আইনের মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো বড় বড় নগরীতে 'নগর সরকার' গঠনের উদ্যোগ নিক। নির্বাচিত মেয়র হবেন নগর প্রশাসনের প্রধান। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী যদি সারা দেশের প্রশাসনের প্রধান হতে পারেন, তাহলে নির্বাচিত মেয়র শুধু একটা নগরীর প্রশাসনের প্রধান হতে পারবেন না কেন?

'নগর সরকার' ছাড়া নগরীর মেয়র নির্বাচন করে ভোটারদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। কারণ এখনকার মেয়র একজন নিধিরাম সর্দার। আমরা প্রকৃত সর্দার চাই।